Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তান লালন পালনের ক্ষেত্রে পিতা মাতার করণীয় ও দায়িত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাবিয়া আক্তার

রোলঃ 228020162

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তান লালন পালনের ক্ষেত্রে পিতা মাতার করণীয় ও দায়িত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাবিয়া আক্তার

রোলঃ 228020162

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সন্তান লালন পালনের ক্ষেত্রে পিতা মাতার করণীয় ও দায়িত্ব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মাবিয়া আক্তার, আইডিঃ 228020162 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সন্তান লালন পালনের ক্ষেত্রে পিতা মাতার করণীয় ও দায়িত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

মাবিয়া আক্তার

(স্বাক্ষর)

মাবিয়া আক্তার

আইডিঃ 228020162

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভুমিকা 6

সন্তান জন্মের আগে প্রস্তুতি..8

মায়ের গর্ভেও শিশু অনেক কিছু শিখে...10

সন্তান জন্মের পর করণীয়...13

শিশুর বেড়ে উঠা এবং ক্রমবিকাশ 16

সন্তানের প্রতি পিতা মাতার চাওয়া..23

পারিবারিক বৈঠক 24

সন্তানের অধিকার...25

সন্তান লালন পালনে সূরা লুকমানের উপদেশ 27

মা দিবস ও বাবা দিবস 33

মায়ের অধিকার...33

সন্তানকে বুঝিয়ে বলতে হবে মা-বাবার সাথে ভাল আচরণে তাদের কী লাভ 35

মা-বাবার আনুগত্য করা ওয়াজিব..36

মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার 37

মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করা নাবীগণের বৈশিষ্ট্য..38

মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় 38

মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহারের উপকারিতা 39

মা-বাবার দু'আ কবুল হয়...39

অনেক সন্তানেরাই জানে না মা-বাবার মৃত্যুর পর কী করণীয়...40

যে সকল ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেছে কিন্তু ছোটবেলায় বাবা-মা থেকে দ্বীনি শিক্ষা পায়নি 41

রেফারেন্স 43

ভুমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

إِنَّ الْحَمْدُ للهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

নিশ্চয় যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমরা তারই প্রশংসা করি, তার কাছে সাহায্য চাই, তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আল্লাহর নিকট আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্টতা ও আমাদের কর্মসমূহের অকল্যাণ থেকে আশ্রয় কামনা করি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন, তাকে গোমরাহ করার কেউ নেই। আর যাকে গোমরাহ করেন তাকে হিদায়াত দেওয়ারও কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকার ইলাহ নেই, তিনি একক, তার কোনো শরীক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। সালাত ও সালাম নাযিল হোক তাঁর ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তার সাহাবীদের ওপর এবং যারা কিয়ামত অবধি ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করেন তাদের ওপর।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো পরিবার। পারিবারিক জীবন থেকেই গড়ে উঠে ইসলামী পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থা। তাই ইসলাম পরিবারের সংশোধন ও শৃঙ্খলাকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। একটি শিশুই একটি জাতির ভবিষ্যৎ। আজকের শিশুই আগামী দিনের কর্ণধার। তার তা'লীম-তরবিয়তের ওপরই নির্ভর করবে আমাদের আগামী দিনের পরিবার বা সমাজ ব্যবস্থা কেমন হবে।

সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার দায়িত্ব সম্পর্কে ইবনুল কাইয়্যুম রাহিমাহুল্লাহু বলেন-একজন আলেম বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম পিতা-মাতাকে তার সন্তানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন। তারপর সন্তানকে জিজ্ঞাসা করবেন তার পিতা-মাতার ব্যাপারে। কেননা সন্তানের উপর পিতা-মাতার যেমন হক রয়েছে ঠিক তেমনই পিতা-মাতার উপরও সন্তানের হক রয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়েছি।

সূরা আনকাবুত:০৮

অনুরূপ আরেক আয়াতে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও, যার জ্বালানি হবে মানুষ এবং পাথর। সূরা আত তাহরীম:৬

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন- 'সন্তানদেরকে ইলম শিক্ষার সাথে সাথে আদব-আখলাকও শিক্ষা দাও।'

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

'তোমরা আল্লাহ তাআলার ইবাদত কর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। আর পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করো।'

সুরা নিসা:৩৬

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

'তোমরা সন্তানদের সাথে ইনসাফ করো।'

সুনানু আবি দাউদ:: ৩৫৪৪

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহ তাআলা সন্তানের ব্যাপারে পিতাকে আগে উপদেশ দিয়েছেন। পরে পিতার ব্যাপারে সন্তানকে উপদেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ

'তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্রতার ভয়ে হত্যা করো না।

'সূরা ইসরা:৩

সন্তান জন্মের আগে প্রস্তুতি

একটি শিশু এসে একটি মেয়ের জীবনকে ধন্য করে তোলে। একজন মেয়ে আর এক জীবনে পদার্পণ করেন মাতৃস্নেহ নিয়ে। প্রকৃত মা সেই, যে সঠিকভাবে সন্তান প্রতিপালন করেন। মা হওয়ার জন্য কেবল জন্মদাত্রী হওয়াই যথেষ্ট নয়। আমাদের দেশে প্রেগন্যান্ট মা শুধু খাওয়া-দাওয়া নিয়েই চিন্তিত থাকেন আর অন্য কোন বিষয় নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামান না।

কিন্তু একজন মুসলিম মায়ের দায়িত্ব অন্যান্য মায়েদের চেয়ে আরো অনেক বেশী। তিনি পড়াশোনা করবেন কিভাবে তার সন্তানকে আদর্শ মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলবেন, কিভাবে তার সন্তানের অন্তরে সঠিক দ্বীনের আলো প্রবেশ করবে। সেজন্য প্রয়োজন ইসলামী শিশু সাহিত্য পড়া, আল কুরআনের তাফসীর পড়া, রসূল (সাঃ)-এর জীবনী পড়া, সাহাবাদের জীবনী পড়া। এছাড়া এখন ইন্টারনেট থেকেও আমরা অনেক ভিডিও দেখার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করতে পারি। এ সময় অনেক সময় পাওয়া যায় তাই এই সময়টা কাজে লাগানো।

মায়ের গর্ভেও শিশু অনেক কিছু শিখে

প্রত্যেক মায়ের গর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্য আকারে অবস্থান করে; অতঃপর পরবর্তী চল্লিশ দিন জমাট রক্তে পরিণত হয়; এরপর এমনিভাবে তা আরো চল্লিশ দিনের মধ্যে মাংসের টুকরায় পরিণত হয়; অতঃপর আল্লাহ একজন ফিরিশতাকে প্রেরণ করেন যাকে মানব শিশুটির ব্যাপারে চারটি বিষয় অর্থাৎ তার রিযিক,হায়াত,তাকদীরের ভালো ও মন্দ সম্পর্কে লিখতে বলা হয়। এরপর উক্ত মানব ভ্রুনের মধ্যে আত্মা (জীবন) দিয়ে দেয়া হয়। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

তিন মাস পর থেকে সে ধীরে ধীরে বড় হতে শুরু করে এবং পাঁচ মাস বয়স থেকে সে শুনতে পায়। তাই তৃতীয় মাস থেকে মায়ের উচিত আস্তে আস্তে পড়ার পরিবর্তে জোরেজোরে কুর'আন হাদীস পড়া, সুন্দর করে শব্দ করে করআন তিলাওয়াত করা।পঞ্চম মাস থেকে গর্ভের সন্তানের সাথে একা একা কথা বলা যেতে পারে, তাকে ভালো ভালো কথা শুনানো যেতে পারে ইত্যাদি।

মায়ের গর্ভে সন্তান নাভীর মাধ্যমে খাদ্যগ্রহণ করে তিল তিল করে বড় হতে থাকে। তাই মায়ের চরিত্রের যথেষ্ট প্রভাব সন্তানের উপর পড়ে। কোন মা যদি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সলাতে নিয়মিত হয়ে না থাকেন, তাহলে এসময় থেকেই তাকে (পাঁচ ওয়াক্ত সলাতে) নিয়মিত হয়ে যাওয়া উচিত। মায়ের মধ্যে যেসকল দোষ-ত্রুটিগুলো রয়েছে সেগুলো এসময় থেকেই আস্তে আস্তে কমিয়ে নিয়ে আসা উচিত।

যিনি সন্তান দিয়েছেন তাঁর ইচ্ছা এই সন্তান সুস্থ হবে নাকি অসুস্থ হবে? এই সন্তান শেষ পর্যন্ত জীবিত থাকবে নাকি মরে যাবে? এই সন্তান বোবা হবে নাকি বিকলাঙ্গ হবে? এ সকল কিছু নির্ভর করছে মহান সৃষ্টিকর্তার উপর। তিনি চাইলে কাউকে সন্তান দেন আবার কাউকে সন্তান দেন না, আবার কাউকে ছেলে দেন আবার কাউকে মেয়ে দেন। তাই আমাদের সবসময় সন্তানের বিষয়ে মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য চাওয়া উচিত, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, তাঁর পছন্দ মতো কাজকর্ম করা উচিত।

সন্তান জন্মের আগে দু'আ

راب إلي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِى إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
রব্বি ইন্নি নাযারতু লাকা মা-ফী বাত্বনী মুহাররারা ফাতাকুব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আতাসসামিউল 'আলীম।

হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমার গর্ভে যা রয়েছে, তা আমি মুক্ত করে (জন্মের পর) আপনার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম, সুতরাং আপনি আমা হতে তা গ্রহণ করুন, নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (সূরা আলে ইমরান : ৩৫)

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء রব্বি হাবলী মিল্লাদুনকা যুররিইয়াতান্ তয়্যিবাতান ইন্নাকা সামি'উদ দু'আয়ি।

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনার নিকট হতে পবিত্র সন্তান প্রদান করুন; নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী। (সূরা আলে ইমরান ৩:৩৮)
رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا

لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

রব্বানা- হাবলানা মিন আযওয়া-জিনা- ওয়া যুররিইইয়া-তিনা-কুররতা আ'ইউনিওঁ ওয়াজ'আলনা- লিলমুত্তাক্বীনা ইমা-মা-

হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন। (সূরা ফুরকান ২৫: ৭৪)

সন্তান জন্মের আগের পিতা মাতার নৈতিক দায়িত্ব

১. মা-বাবা উভয়ে উত্তম ও ভাল কাজের নিয়্যত করা।

২. মা-বাবা উভয়ে হালাল উপার্জন করা।

৩. মা-বাবা উভয়ে হালাল খাবার খাওয়া।

৪. ওয়াক্ত মতো দৈনিক পাঁচ সলাত আদায় করা।
৫. সম্ভব হলে মাঝে মাঝে তাহাজ্জুদ সলাত আদায় করা।

৬. সলাতের পর তাসবীহ পাঠ করা।

৭. দু'জনেই খুব বেশীবেশী ভাল কাজ করা।

৮. প্রতিদিন আল-কুরআন অর্থসহ তিলাওয়াত

৯. নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত শুনা।

১০. ইসলামের উপর অন্যান্য বই অধ্যয়ন করা

১১. মানুষের সাথে আরো বেশী ভালো আচরণ করা।

১২. গরীবদের মাঝে দান-সদাকা করা।

১৩. গীবত বা পরনিন্দা, কুৎসা রটনা, অহংকার ও দাম্ভিকতাপূর্ণ অসুন্দর বা খারাপ কথা বলা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা।

১৪. টিভি/ইন্টারনেটে অশ্লীল নাচ, গান, সিরিয়াল, নাটক, সিনেমা না দেখা।

সন্তান জন্মের আগের মায়ের স্বাস্থ্যগত দায়িত্ব

১. ডাক্তার দ্বারা নিয়মিত চেকআপ করানোর চেষ্টা করা।

২. গর্ভবতীর উপর কোন প্রকার মানসিক বা দৈহিক চাপ সৃষ্টি না করা।

৩. পারিবারিক কলহ থেকে দূরে থাকা।

৪. সবার সাথে হাসি-খুশীভাবে কথা বলা।

৫. মাঝেমধ্যে চিত্ত-বিনোদনের উদ্দেশ্যে বাইরে কোথাও বেড়াতে যাওয়া।

৬. প্রতিদিন অবশ্যই গোসল করা এবং এবং শরীরের প্রতি যত্ন নেয়া।

৭. সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা।

৮. এ সময় বেশীবেশী পানি পান করা।

৯.. গর্ভাবস্থায় সব সময় ঢিলাঢালা পোশাক পরা।

১০. ঝগড়া-ঝাটি না করা, কাউকে গালাগালি না করা।

১১. রাগ কমিয়ে হাসিখুশী থাকার চেষ্টা করা।

সন্তান জন্মের পর করণীয়

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে অন্য কোন কথা বা শব্দ শিশুর কানে প্রবেশ করার পূর্বেই তার কানে আল্লাহর নাম প্রবেশ করানো উত্তম ।

নবজাত সন্তান ছেলে হোক আর মেয়ে হোক উভয়ের ক্ষেত্রেই ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ডান কানে আযান বলা সুন্নাত। এই সময় আযান মসজিদের মুয়াজ্জিনের মতো সুর করে জোরে জোরে দিতে হবে না, আযানের প্রতিটি শব্দ তার কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করে বললেই হবে।

"আবু রাফে (রাঃ) বলেন, ফাতিমা (রাঃ) হাসান ইবনে আলী (রাঃ) -কে প্রসব করলে আমি রসূলুলাহ মুহাম্মদ (সাঃ) -কে হাসানের কানে সলাতের আযানের অনুরূপ আযান দিতে দেখেছি।" (জামে আত-তিরমিযী, আবু দাউদ)

তাহনীক করানো ভূমিষ্ট শিশুর মা বা অন্য যে কেউ সামান্য
কোন মিষ্টি দ্রব্য চিবিয়ে রস বের করে শিশুকে মুখের লালার সাথে মিশ্রিত করে তা আঙ্গুল দ্বারা মুখের ভেতর জিহ্বার তালুতে লাগিয়ে দেয়া সুন্নাহ। (সহীহ বুখারী) তবে যাদের মুখে অসুখ রয়েছে বা যারা পান-সিগারেট খান তাদের এই কাজটি করা উচিত নয়।

দুধপান করানো সন্তানের জন্য মায়ের পক্ষ থেকে প্রথম উপহার। এটি ভূমিষ্ঠ হওয়া সন্তানের জন্য পরিপূর্ণ খাদ্য । এতে আল্লাহ তা'আলা শিশুর যা প্রয়োজন তার সকল উপাদান দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু অনেক মায়েরা আছেন যারা নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাবে বলে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে চান না। এটা অনেকটা ওয়েস্টার্ন কালচারের মতো। ওয়েস্টার্ন অনেক মায়েরা নিজের ফিগার ঠিক রাখার জন্য এমনটা করেন।

সন্তান জন্মের পর সপ্তম দিনের দায়িত্ব

সন্তান পুত্র বা কন্যা যাই হোক না কেন তাদের উত্তম ও সুন্দর অর্থবোধক নাম রাখা । এটি মা-বাবার কাছে সন্তানের হক। বাজারে নামের বই কিনতে পাওয়া যায়। এছাড়া ইন্টারনেটে সার্চ দিলেই শত শত নামের লিস্ট পাওয়া যাবে। সেখান থেকে বাছাই করে একটি সুন্দর অর্থপূর্ন নাম রাখা উচিত। খুব ভালো হয় যে, কিছু নাম পছন্দ করে কোনো যোগ্য আলেমের

কাছ থেকে যাচাই করে নেয়া। কারণ অনেক সময় অনলাইনে সঠিক তথ্য নাও থাকতে পারে। রসূলুল্লাহ মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন: কিয়ামাতের দিন তোমাদের ডাকা হবে তোমাদের নিজের নাম ও বাবার নামসহ। অতএব তোমরা ভাল নাম রাখবে। (আবু দাউদ)

সপ্তম দিনে শিশুর মাথার চুল কামিয়ে (মুণ্ডন) দেয়া । (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম) আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল মুহাম্মদ (সাঃ) একটি ছাগল দিয়ে হাসানের আকীকা করেন এবং বলেন: হে ফাতিমা! তার মাথা কামাও এবং তার চুলের ওজনের সমপরিমাণ রূপা দান কর। তদানুযায়ী আমি তার চুল ওজন করলাম এবং তার ওজন এক দিরহাম বা তার কাছাকাছি হল। (জামে আত-তিরমিযী)

কোন কোন ডাক্তার শিশুর মাথার চুল কামাতে নিষেধ করেন। যদিও মেডিকেল সায়েন্স অনুযায়ী এর কোন জোড়ালো ক্ষতিকারক কারণ নেই। যেসব ডাক্তারের ইসলামের সঠিক জ্ঞান নেই তারা হয়ত এই সুন্নাহ পালনে গুরুত্ব দেন না। চুল ছেটে দেয়ার ফলে শিশুর দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ এবং চিন্তা শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

নবজাতক সন্তান ছেলে হলে দু'টি ছাগল অথবা ভেড়া আর কন্যা হলে একটি ছাগল অথবা ভেড়া তার নামানুসারে যবেহ করা উত্তম। আকীকা করতে হয় সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে, সেদিন সম্ভব না হলে ১৪তম দিনে এবং সেটিও সম্ভব না হলে ২১তম দিনে আকীকা দিতে হবে। এই কুরবানী আল্লাহর হক। অর্থাৎ সন্তান হয়েছে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পশু কুরবানী দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। আকীকার জন্য অনুষ্ঠান করে সেই মাংস রান্না করে আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং গরীব-দুঃখীদের খাওয়ানো যেতে পারে। আর অনুষ্ঠান করতে না চাইলে ঐ মাংস আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং গরীব-দুখীদের মাঝে বিতরণ করে দেয়া যেতে পারে।

রসূল মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন: ছেলেদের আকীকা কর অর্থাৎ তার পক্ষ থেকে কুরবানীর মাধ্যমে রক্ত বইতে দাও; এবং কষ্টদায়ক বস্তু (মাথার চুল) মুন্ডন করে দাও। (সহীহ বুখারী আকীকা প্রসঙ্গে রসূল মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন : পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে সমবয়সী দু'টি ছাগল এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি ছাগল আকীকা দাও। (জামে আত-তিরমিযী)

ছেলে সন্তানের (খতনা)

ছেলে সন্তানকে মুসলমানি করানো সুন্নাহ । রসূল মুহাম্মদ (সাঃ) হাসান ও হুসাইন উভয়ের আকীকা ও খতনা সপ্তম দিনে করেছিলেন। (বায়হাকী) অবশ্যই এই কাজটি ভাল ডাক্তার দিয়ে হসপিটাল বা ক্লিনিকে নিয়ে করাতে হবে। উন্নত দেশে ছেলের মুসলমানি জন্মের কিছু দিনের মধ্যে হসপিটালে ডাক্তাররা করিয়ে দেন । উন্নত দেশের অমুসলিমরাও মুসলমানি করায় স্বাস্থ্যগত উপকারিতার জন্য। আমাদের দেশে একটি অনৈসলামী প্রথা প্রচলন আছে যে, মুসলমানির অনুষ্ঠান করা এবং সবাইকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো ও উপহার গ্রহণ করা । এই ধরনের কোন অনুষ্ঠান বা নিয়ম ইসলামে নেই। আমরা না জানার কারণে আকীকা করি না কিন্তু মুসলমানির অনুষ্ঠান করি, অর্থাৎ যেটা করার কথা সেটা করি না কিন্তু যেটা করার কথা না সেটা করি।

কেউ কেউ মনে করতে পারে যে, ছেলেকে মুসলমানি করালে সে ঐ দিন থেকে মুসলিম হয়। এই ধারণা ঠিক না। প্রতিটি শিশু মুসলিম হয়েই জন্মগ্রহণ করে, এমনকি সে হিন্দু বা খৃষ্টানের ঘরে জন্ম নিলেও। পরবর্তীতে তার মা-বাবা ঐ শিশুকে হিন্দু, খৃষ্টান বা নাস্তিক বানায়। (এই কথাগুলি রসূলুল্লাহ মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সহীহ হাদীসে আছে।)

শিশুর বেড়ে উঠা এবং ক্রমবিকাশ

এক মাস বয়সের শিশু শব্দ শুনলে চমকে উঠে এবং কোন কিছুর দিকে নির্দিষ্টভাবে তাকায়। ২ মাসের সময় কাৎ করে শুইয়ে দিলে চিৎ হতে পারে এবং মানুষের গলার শব্দে আনন্দ বা দুঃখ পায়। ৩ মাসের সময় উপুড় অবস্থায় মাথা ও ঘাড় তোলে, শব্দের উৎস খোঁজে এবং হাসির জবাবে হাসি দিতে চেষ্টা করে। ৪ মাসের সময় কোন জিনিস দেখলে তার দিকে হাত বাড়ায়, পরিচিত চেহারা এবং গলার স্বর চিনতে পারে। ৫ মাসের সময় দু'হাত ধরে টানলে উঠে বসে এবং আয়নায় নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে কথা বলতে চায়। ৬ মাসের সময় স্বল্প অবলম্বনে বসতে পারে এবং কথা বলতে চেষ্টা করে।

৭ মাসের সময় দু'হাতে খেলনা ধরতে পারে এবং কোন কিছু পড়ে গেলে তা অনুসরণ করে । ৮ মাসের সময় হামাগুড়ি দেয় এবং লুকোচুরি খেলতে পছন্দ করে। ৯ মাসের সময় ধরে দাঁড়াতে পারে এবং কারো মুখে শোনা ছন্দ বা সংকেত অনুকরণ করে। ১০ মাসের সময় কাউকে ধরে হাঁটতে পারে এবং একাধিক শব্দ উচ্চারণ করে। ১১ মাসের সময় হাঁটু গেড়ে বসে কোন কিছু অবলম্বন করে মাটি থেকে খেলনা তুলতে পারে এবং বাবা, মামা, দাদা ইত্যাদি শব্দ বলতে চেষ্টা করে। ১২ মাসের সময় বেয়ে বেয়ে উঠানামা করতে পারে, হাততালি দেয় এবং দু' তিনটা শব্দ বুঝতে ও বলতে পারে।

২৪ মাসের মধ্যে শিশুরা দুই তিনটা জিনিসের মধ্যে থেকে তার পছন্দের জিনিসটা খুঁজে বের করতে পারে। দুই বছর বয়সে একটি শিশু ৫০টির মতো শব্দ শিখে ফেলে। যখন সে প্রথম কথা বলতে শিখে তখন দু'টি অথবা তিনটি শব্দের বাক্য তৈরী করতে পারে, যেমন : আরো চাই, উঠো, চলো, বাইরে যাবো, খাবো না ইত্যাদি। চব্বিশ মাসের সময় তারা দৌড়াতে পারে, বলে লাথি দিতে পারে। তিন বছর বয়সে ৩০০ পর্যন্ত শব্দ মনে রাখতে পারে।

এই বয়সে বিভিন্ন রংয়ের নাম শিখে, সাধারণ গুনতে পারে এবং সময় বুঝতে পারে। চার বছর বয়সে গিয়ে ১৫০০ পর্যন্ত শব্দ মনে রাখতে পারে এবং পাঁচ বছর বয়সে গিয়ে ২৫০০ শব্দ পর্যন্ত মনে রাখতে পারে। এই শব্দগুলো দিয়েই সে কথা বলে, বাক্য তৈরী করে। এই সময়ে ছবি আঁকতে পারে। এই বয়সে আল্লাহকে চিনে, পরিবারের মর্ম বুঝে, অন্যদের সাথে খেলতে পছন্দ করে। কিছু কিছু সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে।

৭ থেকে ১০ বছর বয়স থেকে তারা কে ছেলে আর কে মেয়ে তা বুঝতে পারে। ছেলেরা ছেলেদের সাথে এবং মেয়েরা মেয়েদের সাথে খেলতে পছন্দ করে। এই বয়সে মনের মধ্যে নানা ধরনের প্রশ্নের উদয় হয়। এই বয়সে তাদের মধ্যে মানসিক অনুভূতিও জন্ম নেয়।

১০ থেকে ১২ বছর বয়স এই বয়সে ছেলেমেয়েদের মধ্যে বড় ধরনের পরিবর্তন আসে। এই বয়সেই ছেলেমেয়েরা সাধারণত বালেগ হয়ে থাকে। এই বয়সে তারা মানসিক দুঃখ এবং আনন্দ অনুভব করে ।ব্যক্তিগত বিষয়গুলো কিছুটা বুঝতে থাকে। তারা বড়দের মতো চিন্তা করে কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এ সময় তারা নানা রকম মানসিক বিষণ্নতায়ও ভুগে থাকে।

শিশুকে ঘুম পাড়ানো : অনেক মায়েরা শিশুকে যখন ঘুম পাড়ান, তখন আজেবাজে কবিতা এবং গান গেয়ে ঘুম পাড়ান যেগুলোর কোন সুন্দর অর্থ হয় না। যেমন আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা অথবা আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাঝে অথবা হাট্টিমাটিম টিম তারা মাঠে পাড়ে ডিম তাদের খাড়া দুটো শিং ইত্যাদি। আমাদের উচিত শিশুর ঘুমের জন্য দু'আ বলা জোরে জোরে যা শিশু শুনতে পায়, তারপর তাকে আল্লাহর প্রশংসামূলক গান গেয়ে ঘুম পাড়ানো যেতে পারে যা শুনে শিশু উপকৃত হবে, এবং শিশুর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে। এছাড়া কুরআন থেকে ছোট ছোট সূরা এবং অন্যান্য দু'আও তাকে শুনানো যেতে পারে। এভাবে একদিন দেখা যাবে ছোট ছোট সূরা এবং দু'আগুলো তার মুখস্থ হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ আমার মেয়ে এভাবে অনেক গুলো দোয়া শিখে ফেলেছে।

শিশুর সাথে কথা বলা: যে শিশু এখনো কথা বলতে পারে না তার সাথেও কথা বলা উচিত। সে কথা বলতে না পারলেও ঠিকই শুনতে পারে । তাকে এখন যা ভাল ভাল কথা শুনানো হবে এর প্রভাব তার মধ্যে পড়বে। তাই শিশুর সাথে কুরআন হাদীস থেকে সুন্দর সুন্দর কথা বলা উচিত।

শিশুকে গল্প বলা: আমাদের দেশে দাদী-নানীরা নাতী-নাতনীর সাথে নানা রকম গল্প করে থাকেন। কিন্তু তারা সাধারণত শিশুদের সাথে রাজা-রানী, রাজকুমারী, রাজপুত্র আর রাক্ষসের গল্প করে থাকেন যার সাথে বাস্তবের কোন সম্পর্ক নেই। এ সময় তারা যা শুনে তাই মনে রাখে। তাই তাঁদেরকে ইসলামি গল্প, নবী রাসূলদের, সাহাবিদের গল্প এগুলো বলা যেতে পারে তাহলে তারা ইসলাম বিষয়ে জানতে পারবে।

শিশুদের বই কিনে দেয়া: শিশুদের ইসলামিক শিক্ষামূলক এবং সাধারন জ্ঞান বিষয়ে বই কিনে দেয়া উচিত। বাজারে এই বিষয়ে অনেক বই পাওয়া যায়। আমাদের শিশুদের এই ধরনের বই কিনে দেয়া উচিত এবং তাদেরকে সাথে নিয়ে পড়া উচিত। শিশুরা দেখে দেখে শেখে বেশি। আমরা যদি চাই আমাদের সন্তান বই পড়ুক তাহলে আমাদেরকেও বই পড়তে হবে তাদের সামনে।

শিশুর সাথে খেলাধুলা করা: খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুদের মানসিক এবং শারীরিক বৃদ্ধি হয়ে থাকে। তাই তাদের খেলার সুযোগ করে দিতে হবে। মা- বাবার উচিত শিশুদের সাথে খেলাধুলা করা, সামর্থ অনুযায়ী তাদেরকে খেলাধুলার সামগ্রী কিনে দেয়া উচিত । আজকাল বাজারে অনেক প্রকার খেলনা পাওয়া যায় যা শিশুর মানসিক বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। অধিকাংশ মা-বাবাদের প্রশ্ন এই যে, কোন বয়সের বাচ্চার জন্য কোন ধরনের খেলনা দেবো? এছাড়াও অনেক মা-বাবা আছেন যে, বাচ্চা পছন্দ করলেই খেলনা কিনে দেন। কিন্তু হতে পারে ঐ খেলনার গায়ে উপযোগি বয়স লিখাই আছে। তারা সেটা মানতে চান না। তাতে একটু পরে বাচ্চাও আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং পয়সাও নষ্ট হয়। তাই মা-বাবাদের উচিত বাচ্চার বয়স অনুযায়ী খেলনা কিনে দেয়া। আরও একটি বিষয় হচ্ছে শিশুদেরকে শুধু কোলে কোলে না রেখে তাদেরকে ধুলা-বালি-মাটি-কাদার সাথে মিশতে দেয়া। প্রাকৃতিক জিনিস দিয়ে তাদেরকে খেলতে দেয়া উচিত। যেমন আমার বাচ্চাদের দেই আমি।

শিশুদের নিয়ে সতর্কতা

কত বছর পর্যন্ত শিশুকে বুকের দুধ পান করানো যাবে? আমাদের দেশের অনেক মায়েরাই (এবং বাবারাও) জানেন না যে শিশুকে কত বছর পর্যন্ত বুকের দুধ পান করানো যাবে। এই বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের সূরা বাকারার ২৩৩ নং আয়াতে পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, দুই বছর পর্যন্ত । অর্থাৎ একটি শিশুকে জন্মের পর থেকে দুই বছর বা ২৪ মাস পর্যন্ত বুকের দুধ পান করানো যাবে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন :

“যে স্তন্য পানকাল পূর্ণ করতে চায় তার জন্য মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর বুকের দুধ পান করাবে।” (সূরা বাকারা ২ : ২৩৩)

"তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে, তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস" (সূরা আহকাফ : ১৫)

ইবনে আব্বাস (রাঃ)-বলেন যে, যদি কোন নারী নয় মাসে সন্তান প্রসব করে তবে তার দুধ পান করানোর সময়কাল একুশ মাসই যথেষ্ট। আর যদি সাত মাসে সন্তান ভূমিষ্ট হয় তবে দুধ পানের সময়কাল হবে তেইশ মাস। আর যদি ছয় মাসে সন্তান প্রসব করে তবে দুধ পান করানোর সময়কাল হবে পূর্ণ দুই বছর । কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর সময়কাল হলো ত্রিশ মাস। (ইবনে কাসীর)

২য় সন্তান হলে ১ম সন্তানকে গুরুত্ব কম দেয়া: এই কাজটি মোটেও ঠিক নয়। কিন্তু বেশীরভাগ মা-বাবারা এবং পরিবারের অন্যান্যরা এই ভুল কাজটি করে থাকেন। ১ম সন্তান এবং ২য় সন্তান যদি কাছাকাছি বয়সের হয়ে থাকে তাহলে এই সমস্যা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করে। ১ম সন্তান নিজেকে অসহায় মনে করে, তাকে অবহেলার কারণে সে দিন দিন ক্ষেপে যায়, ছোট ভাই বা বোনকে শত্রু মনে করে, তাকে সহ্য করতে পারে না, সুযোগ পেলে তাকে আঘাতও করে। ১ম সন্তানকে গুরুত্ব কম দেয়ার কারণে দিন দিন তার মনমানসিকতার উপর প্রচন্ড চাপ পড়ে। এতে সে অসুস্থ হয়ে যেতে পারে, তার পড়ালেখারও ক্ষতি হতে পারে, মা-বাবার প্রতিও তার ভালবাসা কমে যেতে পারে

২য় সন্তান গর্ভে এলে তখন থেকেই ১ম শিশু সন্তানকে বোঝাতে হবে যে, তার একটা ছোট ভাই বা বোন আসছে। সে তাকে অনেক ভালোবাসে, তার সাথে খেলবে ইত্যাদি। এভাবে ১ম সন্তানকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে। ১ম সন্তানের বয়স যদি ৫+ বছর হয়, তাহলে তাকে দিয়ে নবজাতকের কিছু কাজে যুক্ত করানো যেতে পারে। তবে মা-বাবার চেষ্টা করা উচিত নবজাতকের পাশাপাশি পূর্বের শিশু সন্তানগুলিকেও আলাদা করে একটু সময় দেয়া। তা না হলে তারা হিংসাত্মক মনোভাব ধারণ করবে।

বাচ্চারা খেলতে গিয়ে ব্যাথা পেলে: অনেক সময় খেলতে গিয়ে বাচ্চারা ব্যাথা পায়, হয়তো হাত-পায়ের কোথাও ছিলে যায়, হয়তো রক্ত বের হয় অথবা মচকে যায়। কোন কোন মা-বাবারা সন্তানের এই দুর্ঘটনার জন্য তার প্রতি সহানুভূতিসূলভ আচরণ না করে বরং তাকে বকাঝকা করেন। যেমন বলে:

ভাল হয়েছে, তুই মর, মর, আরো বেশী করে কর ইত্যাদি। মা-বাবা সন্তানের চিকিৎসা ঠিকই করেন কিন্তু একই সাথে এই অমানবিক আচরণও করেন। শিশু দুষ্টামী করতে গিয়ে বা খেলতে গিয়ে ব্যাথা পেতেই পারে। তখন তাকে সহানুভুতি না দেখিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করাটা

মোটেও ঠিক না। এতে সে মানসিকভাবেও প্রচন্ড আঘাত পায়। নিম্নে একটি ভিডিও লিংক দেয়া হলো যা দেখে আমরা এ বিষয়ে খুবই উপকৃত হতে পারি।

YouTube

Link:https://youtu.be/XHc9IBR6COU

Facebook link :https://www.facebook.com/shishu.lalon.pa

সন্তানদের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব করা ঠিক নয় :

মা-বাবাদের আরো একটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে, আর তা হচ্ছে সন্তানদের মধ্যে যেন পক্ষপাতিত্ব না করা। যাদের কয়েকটি সন্তান তারা অনেক সময় নিজ সন্তানদের একেকজনকে একেক রকম চোখে দেখে থাকেন, একেকজনকে একেক রকম ভালবাসেন বা একেকজনকে একেক রকম গুরুত্ব দেন। যেমন, ডাইনিং টেবিলে খেতে বসেছে সব ছেলেমেয়েরা এক সাথে, সেখানে হয়তো ভাল ভাল আইটেমগুলো প্রায় সময়ই একটি সন্তানকে দেয়া হয়, এতে অন্য সন্তানরা মনে কষ্ট পায়। মনে রাখতে হবে সন্তান সবগুলোই একই মা-বাবার। মা-বাবা যদি তাদের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব করেন তাহলে তা তারা অনায়াসেই বুঝতে পারে এবং মনে প্রচন্ড কষ্ট পায়। এতে সন্তানের পড়ালেখার ক্ষতি হয় এবং মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ভালবাসা কমে যায়।

রসূলুল্লাহ মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন: তোমাদের

সন্তানদের সম-অধিকার ও সম-ব্যবহারের অধিকার রয়েছে যেমন তোমাদের অধিকার রয়েছে সন্তানদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভের। (আবু দাউদ)

রসূলুল্লাহ মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন: আল্লাহকে ভয় কর, আর তোমাদের সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ কর। (সহীহ বুখারী)

শিশুদের গায়ে হাত তোলা ঠিক নয়: আমরা ছোটবেলায় মা-বাবার হাতে অনেক মার খেয়েছি। স্কুলে তো শিক্ষকের বেতের বাড়ির কথা মনে পড়লে এখনো গা শিউরে উঠে। তারা আমাদের ভালোর কথা চিন্তা করেই হয়তো গায়ে হাত তুলেছেন। কিন্তু আমরা আমাদের শিশুদের এভাবে মারবো না। প্রথমে তাদের বুঝিয়ে বলতে হবে। যদি না শুনে তাহলে একটু ভয় দেখানো যেতে পারে। একটুতেই গায়ে হাত তুললে তারা আর ভয় পায় না।

দশ বছর বয়স হলে শিশুদের বিছানা আলাদা করে দিতে হবে: আমাদের দেশের কালচারে শিশুরা সাধারণত মা-বাবার সাথেই ঘুমায়। এখন প্রশ্নঃ শিশুরা কত বছর বয়স পর্যন্ত মা-বাবার সাথে ঘুমাতে পারবে? আবু দাউদের সহীহ হাদীসে রসূল (সাঃ) বলেছেন দশ বছর বয়স হলে শিশুদেরকে আলাদা বিছানা করে দিতে, সে যেন আর মা-বাবার সাথে না ঘুমায়।

কাজের বুয়ার মাধ্যমে শিশু লালন-পালন ঠিক নয়। সন্তানের বেড়ে উঠার বয়সে আমরা বাবা-মায়েরা একটা বড় ধরণের ভুল করে থাকি আর তা হচ্ছে ছোট সন্তানকে কাজের বুয়ার মাধ্যমে লালন-পালন করা। স্বাভাবিকভাবেই একজন কাজের বুয়ার কতটুকু জ্ঞান রয়েছে একটি শিশুকে নীতি-নৈতিকতা দিয়ে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে। বুয়াদের সাধারণত সাধারণ শিক্ষাই থাকে না তার উপর আবার ইসলামী শিক্ষা থাকা তো দূরের কথা। আমরা যদি খুব গভীরভাবে চিন্তা করে দেখি বিষয়টি কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

বাস্তবে দেখা গেছে যে বাংলাদেশের ডে-কেয়ারগুলোতে মুলতঃ কাজের বুয়ারাই শিশুদের লালন-পালন করে থাকে । একটি শিশুর সর্বপ্রথম গৃহ শিক্ষীকা হচ্ছেন তার মা। সন্তান আল্লাহর দেয়া আমানত, এই মহামূল্যবান আমানত বুয়ার হাতে ছেড়ে না দিয়ে মায়ের উচিত সেই দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করা। যারা চাকুরী করেন তাদেরও এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে একটি উপায় বের করা।

সন্তানের প্রতি পিতা মাতার চাওয়া

আমরা সবাই চাই সন্তানরা ভাল হোক, ভাল পথে চলুক

প্রতিটি মা-বাবাই চান তাদের সন্তানরা ভাল হোক, সঠিক পথে থাকুক, তারা ইসলামী মনমানসিকতার হোক। কিন্তু আমাদের এই চাওয়াটা শুধু মুখের মধ্যেই সীমাবদ্ধ অর্থাৎ আমরা মা-বাবারা সবাই চাই সন্তান ভাল হোক কিন্তু আমরা নিজেদের ভাল হওয়ার ব্যাপারে তেমন সচেতন এবং সচেষ্ট নই। আমরা নিজেরা যেভাবে ইচ্ছে চলবো, যেখানে ইচ্ছে যাবো কিন্তু সন্তানদের বেলায় চাই বিনা চেষ্টাতেই তারা সঠিক পথে চলুক যা কখনো সম্ভব নয়।

মাটি যখন নরম থাকে তখন তা দিয়ে যেমন ইচ্ছে তেমন পাত্র তৈরী করা যায়। কিন্তু মাটি শক্ত হয়ে গেলে তখন তা দিয়ে যেমন ইচ্ছে তেমন পাত্র তৈরী করা খুবই কঠিন। পাত্র যদিও তৈরী করা যেতে পারে সেজন্য যথেষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। তাই আমাদের সন্তান যখন কম বয়সের থাকে তখন থেকেই উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। অন্যথায় বড় হয়ে গেলে এই পরিবেশে সঠিক পথে নিয়ে আসা খুবই কঠিন। যাদের সন্তান বড় হয়ে গেছে তাদের তাই বলে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

পারিবারিক বৈঠক

পারিবারিক শিক্ষা একজন মানুষের ভিত তৈরী করে। এ শিক্ষা এত শক্তিশালী যা একজন ব্যক্তির সারাজীবনের জন্য দিক নির্দেশনার কাজ করে। সাপ্তাহে এক দিন হলেও এক ঘন্টা বা দুই ঘন্টা সময় নিয়ে বসা উচিত। সাথে পরিবারের সকল সদস্য। স্ত্রী, সন্তান ও অন্য কেউ যদি থেকে থাকে। সকলকে নিয়ে সুন্দর আনন্দঘন পরিবেশে পারিবারিক বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে। খোলামনে, আন্তরিকতার সাথে। পরস্পরকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে কোন সমস্যা আছে কিনা। সন্তানদের একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা যেতে পারে।

এরপর কুরআনের তাফসীর নিয়ে বসা যেতে পারে। সূরা ফাতিহা দিয়ে শুরু। সূরা ফাতিহার সরল অর্থ সবাইকে শুনানোর পর এর তাফসীর শুরু করতে হবে। সকলকে প্রতিটি আয়াতের অর্থ ও এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এক এক করে শুনানো যেতে পারে। জিজ্ঞেস করতে হবে কারো কোন কিছু যোগ করার আছে কিনা। সকলকেই বলার সুযোগ দিতে হবে। তারপর সূরা ফাতিহার শিক্ষা বাস্তব জীবনের আলোকে মিলানোর চেষ্টা করতে হবে। এ কাজটি প্রতি সপ্তাহে করতে হবে। একেক সপ্তাহে একেক সূরা নিয়ে আলোচনা হবে। পারিবারিক বৈঠকের উদ্দেশ্য থাকবে পরস্পর সম্পর্ক বৃদ্ধি ও আদর্শ পরিবার গঠন।

সন্তানের অধিকার

সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তম নিয়ামত এবং আমানত। নারীদেরকে মায়ের মর্যাদার আসনে আসীন আর পুরুষদের বাবা হিসেবে শ্রদ্ধার সাথে সমাজে পরিচিত হওয়ার এ এক অন্যতম মাধ্যম। এ সন্তান পুত্র কি কন্যা তা বিচার্য নয়, এতে মা-বাবার কারোর কোন হাত নেই। এটি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তা'আলার ফায়সালায় হয়ে থাকে। তবে মা-বাবা যদি নেককার তাকওয়াবান, হকের ব্যাপারে অত্যন্ত শক্তিশালী ও মজবুত ঈমানের অধিকারী হন তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে নেককার ও বরকতময় সন্তান লাভকরবেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে নির্দেশ দিচ্ছেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ﴿۶﴾

হে মুমিনগণ! নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা কর সেই আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। তাতে নিয়োজিত আছে কঠোর স্বভাব, কঠিন হৃদয় ফেরেশতাগণ, যারা আল্লাহর কোন হুকুমে তাঁর অবাধ্যতা করে না এবং সেটাই করে, যার নির্দেশ তাদেরকে দেওয়া হয়। (সূরা আত তাহরীম : ৬)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ مَاۤ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَیْءٍ ؕ كُلُّ امْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿۲۱﴾

“আর সে সব লোক যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে অতঃপর তাদের সন্তানগণও ঈমানের সাথে তাদের পথ অনুসরণ করেছে, তাদের সাথে তাদের সন্তানদেরকে আমি মিলিত করব। আর আমি তাদের কোন আমলই বিনষ্ট করব না। প্রতিটি লোক যা কিছু আমল করে তা আমার নিকট দায়বদ্ধ থাকে।” (সূরা আত্ব তূর : ২১)“

يُّبَصَّرُوْنَهُمْ ؕ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِیْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۭ بِبَنِيْهِ ﴿۱۱﴾ وَ صَاحِبَتِهٖ وَ اَخِيْهِ ﴿۱۲﴾ وَ فَصِيْلَتِهِ الَّتِیْ تُـْٔوِيْهِ ﴿۱۳﴾

"অথচ তারা একজন আরেকজনকে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাবে, (আখিরাতের ময়দানে) অপরাধী ব্যক্তি আযাব থেকে (নিজেকে) বাঁচাতে মুক্তিপণ হিসেবে তার সন্তানদের দিতে চাইবে। (দিতে চাইবে) নিজের স্ত্রী এবং নিজের ভাইকেও। এবং নিজের পরিবারভুক্ত এমন আপনজনদেরও, যারা তাকে (জীবনভর) আশ্রয় দিয়েছিল।” (সূরা মায়ারিজ : ১১-১৩)

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,,,

“তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গের নিকট যাও । তাদের মধ্যে বসবাস কর, তাদের (দ্বীনি) জ্ঞান শিক্ষা দাও এবং সেই অনুযায়ী আমল করার জন্যে তাদের আদেশ দাও ।” (সহীহ্ বুখারী)

নাবী মুহাম্মদ(সাঃ)-বলেছেন : “আল্লাহ যখন তাঁর কোনো বান্দাকে লোকদের উপর কর্তৃত্ব দান করেন, কিয়ামতের দিন তিনি তাঁর সেই বান্দার কাছ থেকে তার অধীনস্থ লোকদের সম্পর্কে অবশ্যই হিসাব গ্রহণ করবেন। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন সে তার অধীনস্থ লোকদের উপর আল্লাহর দ্বীন বাস্ত বায়ন করেছে, নাকি তা করে নাই? এমনকি প্রত্যেককে তার নিজস্ব পরিবার পরিজন সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রশ্ন করা হবে ।” (মুসনাদে আহমদ)

“মানুষ যখন মরে যায় তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমলের উপকারিতা সে কিয়ামত পর্যন্ত পেতে থাকে । (১) সদকায়ে জারিয়া (২) এমন সৎ জ্ঞান যা সে বিতরণ করেছে এবং (৩) নেক সন্তান যে তার জন্য দু'আ করবে ।” (সহীহ্ মুসলিম)

“নিশ্চয়ই তোমার উপর তোমার প্রতিপালকের, তোমার শরীরের, তোমার সন্তানের হক রয়েছে, অতএব হকদারকে তার হক প্রদান কর ।” (সহীহ্ বুখারী

নাবী মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, “তোমরা নিজেদের সন্তানদের সাথে কোমল ব্যবহার করো এবং তাদের উত্তম প্রশিক্ষণ প্রদান করো ।” (ইবনে মাজাহ)

সন্তান লালন পালনে সূরা লুকমানের উপদেশ

আল কুরআনে সূরা লুকমানে লুকমান(আঃ) তার ছেলেকে যেভাবে উপদেশ দিয়েছেন, তা এই চ্যাপ্টারে আলোচনা করা হল । কারণ, লুকমান(আঃ) ছেলেকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা এতই সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য যে, মহান আল্লাহ তা'আলা তা কুরআনে কারীমে উল্লেখ করে কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত উম্মতের জন্য তিলাওয়াতে উপযোগী করে দিয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা আদর্শ করে রেখেছেন । লুকমান(আঃ) কোন নাবী বা রসূল ছিলেন না, তিনি একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন । নিয়মিত জ্ঞান চর্চা করতেন এবং তার সন্তানদের সঠিক শিক্ষা দিতেন তাই মহান আল্লাহ তাকে খুব ভালবাসতেন এবং তাঁর নামে কুরআনে একটি সূরা নাযিল করেছেন। লুকমান (আঃ)তাঁর ছেলেকে যে উপদেশগুলো দিয়েছেন তা নিম্নরূপ : মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুরআনে বলেন :

প্রথম উপদেশ

“হে প্রিয় বৎস আল্লাহর সাথে শিরক করো না, নিশ্চয় শিরক হল বড় যুলুম ।” (সূরা লুকমান, ৩১ : ১৩)

এখানে লক্ষণীয় যে, প্রথমে তিনি তার ছেলেকে শিরক হতে বিরত থাকতে নির্দেশ দেন । একজন সন্তান তাকে অবশ্যই জীবনের শুরু থেকেই আল্লাহর তাওহীদে বিশ্বাসী হতে হবে। কারণ, তাওহীদই হল, যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বিশুদ্ধতা ও নির্ভুলতার একমাত্র মাপকাঠি । তাই তিনি তার ছেলেকে প্রথমেই বলেন, আল্লাহর সাথে ইবাদতে কাউকে শরিক করা হতে বেঁচে থাক । যেমন, মৃত ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করা অথবা পীর-আউলিয়াদের নিকট সাহায্য চাওয়া বা প্রার্থনা করা ইত্যাদি । এছাড়াও এ ধরনের আরও অনেক কাজ আছে, যেগুলো শিরকের অন্তর্ভুক্ত । রসূল মুহাম্মদ (সাঃ) বলেন, “দু’আ হল ইবাদত” । সুতরাং আল্লাহর সৃষ্টির নিকট দু'আ করার অর্থ হল, সৃষ্টির ইবাদত করা, যা শিরক ।

দ্বিতীয় উপদেশ

“আর আমি মানুষকে তার মা-বাবার ব্যাপারে [সদাচরণের] নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে, তাকে গর্ভেধারণ করে । আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে; সুতরাং

আমার ও তোমার মা-বাবার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন-তো আমার কাছেই ।" (সূরা লুকমান, ৩১ :১৪)

তিনি তার ছেলেকে কেবলই আল্লাহর ইবাদত করা ও তার সাথে ইবাদতে কাউকে শরীক করতে নিষেধ করার সাথে সাথে মা-বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করার উপদেশ দেন । কারণ, মা-বাবার অধিকার সন্তানের উপর অনেক বেশি। মা তাকে গর্ভধারণ, দুধ-পান ও ছোটবেলা লালন-পালন করতে গিয়ে অনেক জ্বালা-যন্ত্রণা ও কষ্ট সইতে হয়েছে। তারপর তার বাবাও লালন-পালনের ব্যয়ভার, লেখাপড়া ও ইত্যাদির দায়িত্ব নিয়ে তাকে বড় করছেন এবং মানুষ হিসেবে গড়ে তুলছেন । তাই তারা উভয়ই সন্তানের পক্ষ হতে অভিসম্পাত ও সেবা পাওয়ার অধিকার রাখে ।

তৃতীয় উপদেশ

"আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে জোর চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তখন তাদের আনুগত্য করবে না। এবং দুনিয়ায় তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে। আর আমার অনুসরণ কর তার পথ, যে আমার অভিমুখী হয়। তারপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব, যা তোমরা করতে।" (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৫)

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, 'যদি তারা উভয়ে তোমাকে পরিপূর্ণরূপে তাদের দ্বীনের আনুগত্য করতে বাধ্য করে, তাহলে তুমি তাদের কথা শুনবে না এবং তাদের নির্দেশ মানবে না। তবে তারা যদি দ্বীন কবুল না করে, তারপরও তুমি তাদের সাথে কোন প্রকার অশালীন আচরণ করবে না। তাদের দ্বীন কবুল না করা তাদের সাথে দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করাতে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না । তুমি তাদের সাথে ভালো ব্যবহারই করবে । আর মু'মিনদের পথের অনুসারী হবে, তাতে কোন অসুবিধা নেই ।'

চতুর্থ উপদেশ

“হে আমার প্রিয় বৎস! নিশ্চয় তা [পাপ-পুণ্য] যদি সরিষা দানার পরিমাণও হয়, অতঃপর তা থাকে পাথরের মধ্যে কিংবা আসমানসমূহে বা জমিনের মধ্যে, আল্লাহ তাও নিয়ে আসবেন; নিশ্চয় আল্লাহ সুক্ষ্মদর্শী সর্বজ্ঞ।” (সূরা লুকমান, ৩১ : ১৬)

আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, অন্যায় বা অপরাধ যতই ছোট হোক না কেন, এমনকি যদি তা শস্য-দানার সমপরিমাণও হয়, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তা'আলা তা উপস্থিত করবেন এবং মীযানে (দাড়িপাল্লায়) ওজন দেয়া হবে । যদি তা ভালো হয়, তাহলে তাকে ভালো প্রতিদান দেয়া হবে । আর যদি খারাপ কাজ হয়, তাহলে তাকে খারাপ প্রতিদান দেয়া হবে ।

পঞ্চম উপদেশ

“হে আমার প্রিয় বৎস সলাত কায়েম কর । ” (সূরা লুকমান, ৩১ : ১৭)

তুমি সলাতকে তার ওয়াজিবসমূহ ও রোকনসমূহ সহ আদায় কর । সমাজে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত প্রতিষ্ঠা কর ।

ষষ্ঠ উপদেশ

“তুমি ভালো কাজের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজ হতে মানুষকে নিষেধ কর ।” (সূরা লুকমান, ৩১ : ১৭)

বিনম্র ভাষায় তাদের দাওয়াত দাও, যাদের তুমি দাওয়াত দেবে তাদের সাথে কোন প্রকার কঠোরতা করো না ।

সপ্তম উপদেশ

“যে তোমাকে কষ্ট দেয় তার উপর তুমি ধৈর্যধারণ কর।' (সূরা লুকমান, ৩১ : ১৭)

এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, যারা ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং খারাপ ও মন্দ কাজ হতে মানুষকে নিষেধ করবে তাকে অবশ্যই কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে এবং অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে । যখন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে তখন তোমার করণীয় হল, ধৈর্যধারণ করা ও ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ।

অষ্টম উপদেশ

“আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না ।” (সূরা লুকমান, ৩১ : ১৮)

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, ‘যখন তুমি কথা বল অথবা তোমার সাথে মানুষ কথা বলে, তখন তুমি মানুষকে ঘৃণা করে অথবা তাদের উপর অহংকার করে, তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে না । তাদের সাথে হাস্যোজ্জ্বল হয়ে কথা বলবে । তাদের জন্য উদার হতে হবে এবং তাদের প্রতি বিনয়ী হতে হবে ।’

নবম উপদেশ

“অহংকার ও হঠকারিতা প্রদর্শন করে জমিনে হাটা চলা করবে না ।” (সূরা লুকমান, ৩১ :১৮)

কারণ, এ ধরনের কাজের কারণে আল্লাহ কাউকে পছন্দ করেন না । এ কারণেই মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, “নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না ।” অর্থাৎ যারা নিজেকে বড় মনে করে এবং অন্যদের উপর বড়াই করে, মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের পছন্দ করেন না । দশম উপদেশ “আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর।” (সূরা লুকমান, ৩১ :১৯) খুব স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে হবে। খুব দ্রুত হাঁটা যাবে না আবার একেবারে মন্থর গতিতেও না । মধ্যম পন্থায় চলাচল করতে হবে অর্থাৎ নমনীয় হয়ে হাটা চলা করা অভ্যাস করতে হবে । চলাচলে যেন কোন প্রকার সীমালঙ্ঘন না হয় ।

একাদশ উপদেশ

নরম সুরে কথা বলা । লুকমান হাকীম তার ছেলেকে নরম সুরে কথা বলতে আদেশ দেন । মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,
“তোমার আওয়াজ নিচু কর।” আর কথায় কথায় কোন প্রকার বাড়াবাড়ি করবে না । বিনা প্রয়োজনে তুমি তোমার আওয়াজকে উঁচু করো না। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, “নিশ্চয় সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হল, গাধার আওয়াজ।” (সূরা লুকমান, ৩১ : ১৯)

আল্লামা মুজাহিদ বলেন, ‘সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হল, গাধার আওয়াজ । অর্থাৎ, মানুষ যখন বিকট আওয়াজে কথা বলে, তখন তার আওয়াজ গাধার আওয়াজের সাদৃশ্য হয়। আর এ ধরনের বিকট আওয়াজ মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট একেবারেই অপছন্দনীয়। বিকট আওয়াজকে গাঁধার আওয়াজের সাথে তুলনা করা প্রমাণ করে যে, বিকট শব্দে আওয়াজ করে কথা বলা হারাম। কারণ, মহান আল্লাহ তা'আলা এর জন্য একটি খারাপ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন ।

শিশুদের প্রতি

নাবী মুহাম্মাদ(সাঃ)-এর ভালোবাসা

নাবী মুহাম্মাদ(সাঃ)-এর অন্তরে শিশুদের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও অকৃত্রিম

ভালোবাসা ছিল। একবার নাবী মুহাম্মাদ সাঃ) এ-এর কানে হুসাইন-এর কান্নার শব্দ এলো। এতে তিনি ভীষণভাবে ব্যথিত হলেন। তিনি ফাতিমা-কে বললেন, তুমি কি জান না, তার কান্না আমাকে কষ্ট দেয়? আনাস বলেন, রসূলুল্লাহ শিশু-কিশোরদের কাছ দিয়ে যাতায়াতকালে তাদের সালাম করতেন। একবার রসূলুল্লাহ এ ভাষণদানের নিমিত্তে মিম্বরে আরোহণ করে দেখতে পেলেন যে, হাসান ও হুসাইন দৌড়াদৌড়ি করছেন এবং পা

পিছলে পড়ে যাচ্ছেন। তিনি ভাষণদান বন্ধ করে মিম্বর থেকে নেমে এলেন।

শিশু দু'টির দিকে অগ্রসর হয়ে দুই বাহুতে উঠিয়ে নিলেন। তারপর মিম্বরে আরোহণ করে বললেন, হে লোকসকল! তোমাদের ধন-সম্পদ এক পরীক্ষার বস্তু, আল্লাহর এ বাণী সত্যিই।

একদিন রসূলুল্লাহ (সা:) সলাত আদায় করছিলেন। আর তখন হাসান ও হুসাইন এসে তাকে সিজদারত অবস্থায় পেয়ে একেবারে পিঠে চড়ে বসলেন। তিনি সিজদা দীর্ঘায়িত করলেন। আর তারা পিঠ থেকে না নামা পর্যন্ত তাদেরও নামিয়ে দিলেন না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ সালাম ফিরালে সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা লক্ষ্য করলাম যে, আপনি সিজদা দীর্ঘায়িত করেছেন। তিনি উত্তরে বললেন, আমার নাতিদ্বয় আমাকে ঘোড়া বানিয়েছে। কাজেই তাদের তাড়াতাড়ি নামিয়ে দেয়াটা আমার পছন্দ হয়নি।

রসূলে কারীম (সাঃ) এ কখনো কখনো শিশুদের কান্না শুনতে পেলে সলাত সংক্ষেপ করে দিতেন। আনাস বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর তুলনায় সন্তান-সন্ততির প্রতি অধিক স্নেহ-মমতা পোষণকারী আমি কাউকে দেখিনি। তার পুত্র ইবরাহীম মদিনার উঁচু স্থানে ধাত্রীমায়ের কাছে দুধপান করতেন। তিনি প্রায়ই সেখানে যেতেন এবং আমরাও তার সঙ্গে যেতাম। তিনি ওই ঘরে যেতেন অথচ সেই ঘরটি প্রায়ই ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। কারণ ইবরাহীমের ধাত্রী মায়ের স্বামী ছিলেন একজন কর্মকার। তিনি ইবরাহীমকে কোলে তুলে নিতেন এবং আদর করে চুমু দিতেন, এরপর চলে আসতেন। বর্ণনাকারী বলেন, যখন ইবরাহীম ইন্তেকাল করেন তখন রসূলুল্লাহ বললেন, ইবরাহীম আমার পুত্র ।সে দুধপানের বয়সে ইন্তেকাল করেছে। সুতরাং জান্নাতে তাকে একজন ধাত্রী দুধপান করাবে। নাবী এ বলেছেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদের যত্ন নেবে এবং তাদের আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেবে। নাবী(সাঃ) আরও বলেছেন, তোমরা শিশুদের ভালোবাস এবং তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর। তাদের সঙ্গে কোনো ওয়াদা করলে তা পূর্ণ কর। কেননা তারা তোমাদেরকে তাদের রিজিক সরবরাহকারী বলে জানে।

পরিশেষে বলা যেতে পারে, নাবী (সা:) এ-এর অকৃত্রিম ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা, সবার জন্য নিবেদিত। তিনি শিশুদেরকে খুব ভালোবাসতেন, আদর করতেন, স্নেহ করতেন। কাজেই আমাদেরও শিশুদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা রাখা উচিত। ইবন উমর বলেন, রসূলে কারীম (সা:) ৩০-এর নেতৃত্বাধীন কোনো যুদ্ধে এক মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। এতে রসূলে কারীম গভীরভাবে মর্মাহত হন এবং নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেন। তিনি শিশুদের এতটাই ভালোবাসতেন অথচ আমাদের সমাজের শিশুরা কতই না অবহেলিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত। আমরা কি পারি না এই বঞ্চিত শিশুদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে সমাজকে কলঙ্কমুক্ত করতে?

মা দিবস ও বাবা দিবস

পাশ্চাত্যের মতো আমাদের দেশেও মা দিবস ও বাবা দিবস চালু হয়েছে। এর ভাল দিকও রয়েছে যেমন এই দিনগুলোতে মা এবং বাবার অধিকার ও সন্তানের দায়িত্ব নিয়ে নানা রকম সেমিনার এবং পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হয়, এতে আমাদের সন্তানরা অনেক কিছু জানতে পারে। তবে এই বিষয়ে আমাদেরকে একটু সতর্ক থাকতে হবে। তারা যেন মা দিবস এবং বাবা দিবসে অভ্যস্ত হয়ে না যায়, এই কালচার যেন তাদের রক্তে প্রবেশ করতে না পারে।

আমরা জানি পাশ্চাত্যে ছেলেমেয়েরা ১৮ বছর হলেই মা-বাবাকে ছেড়ে চলে যায় এবং তারা পরবর্তী জীবনে একাকীই বড় হতে থাকে। একসময় মা-বাবার প্রতি তাদের আর টান থাকে না এবং তারা আর মা-বাবার কোন দায়িত্বও পালন করে না। দায়িত্ব পালন করাতো দূরের কথা অনেক সময় মা-বাবা জানেই না ছেলেমেয়েরা কোন দেশে বা কোন শহরে থাকে! তাই পাশ্চাত্য সমাজ দু'টি দিন নির্দিষ্ট করে নিয়েছে মা-বাবাকে স্মরণ করার জন্যে। একদিন বাবার জন্যে এবং অন্য আর একটি দিন মায়ের জন্যে। বছরের এই দিনটি আসলে ছেলেমেয়েরা মা-বাবাকে স্মরণ করে গ্রিটিংস কার্ড পাঠায়, গিফ্ট পাঠায়, ফুল পাঠায়, চকলেট/ক্যান্ডি পাঠায়। তারপর আবার একবছর কোন খোঁজ খবর রাখে না। কিন্তু ইসলাম তার উল্টো। মা-বাবার সমস্ত দায়-দায়িত্ব তাদের সন্তানদের উপর। সন্তানরা যদি এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তাহলে তাকে মহান আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। ইসলামে প্রতিদিনই অর্থাৎ বছরের ৩৬৫ দিনই মা দিবস এবং বাবা দিবস।

মায়ের অধিকার

আমাদের বেশীরভাগ ছেলেমেয়েরাই জানে না কুরআন-হাদীসের আলোকে মা-বাবার গুরুত্ব। সর্বপ্রথমে বলতে হয় যে এখানে ছেলেমেয়েদের তেমন একটা দোষ নেই। কারণ মা-বাবারাই তাদেরকে এই বিষয়ে সময় থাকতে শিক্ষা দেয় না। প্রতিটি ছেলেমেয়ের জন্য বিষয়টি এতো গুরুত্বপূর্ণ যে তাদের জান্নাত ও জাহান্নাম নির্ভর করে মা-বাবার সন্তুষ্টির উপর। এই চ্যাপ্টারে আমরা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে দেখবো যে মা-বাবাকে কীভাবে গুরুত্ব দিতে হয়। দেখবো আল্লাহ এবং তাঁর রসূল এ কীভাবে মা-বাবাকে সম্মান দিয়েছেন।

মায়ের অধিকার বাবার থেকে তিনগুণ বেশী

এক ব্যক্তি রসূল এ-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! আমার সুন্দর আচরণের সবচেয়ে বেশী হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে জিজ্ঞেস করলো, অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে জিজ্ঞেস করলো, অতঃপর কে? নাবী কারীম বললেন, তোমার মা। সে বললো, অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার বাবা। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

এই হাদীসে আমরা দেখলাম যে বাবার চেয়ে মায়ের গুরুত্ব তিনগুণ বেশী। এর কারণ সূরা লুকমান এবং সূরা আহকাফে বলা হয়েছে। মা এমন তিনটি কাজ করেন যা বাবা করেন না আর তা হচ্ছে- ১) নয়-দশ মাস গর্ভধারণ করা, ২) সন্তান প্রসব করা ৩) দুই বৎসর দুধ পান করানো। মা সন্তানের জন্য যে পরিমান কষ্ট করেন তা বাবা করেন না। তাই ইসলামে মাকে এতো বেশী সম্মান দেয়া হয়েছে। সন্তানের ক্ষেত্রে মায়ের গুরুত্ব এবং সম্মান যেমন বেশী তেমনি তার সন্তানের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যও বেশী। সন্তানের শিশুকালটি সাধারণত ঘরেই কাটে আর তার লালন-পালন এবং শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে মা-ই বেশী ভূমিকা রেখে থাকেন। তবে আজকাল বাবারাও এই বয়সে যথেষ্ট ভূমিকা রাখেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

আমি মানুষকে মা-বাবার সাথে সুন্দর আচরণের তাগিদ দিয়েছি। তার মা অনেক কষ্টে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং বহু কষ্ট করে ভূমিষ্ট করেছে। গর্ভে ধারণ করা ও দুধ পান করানোর (কঠিন কাজের) সময়কাল হলো আড়াই বছর। (সূরা আল-আহকাফ: ১৫)

তিনি আরো বলেন:

আমি মানুষকে তার মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে গর্ভে ধারণ করেছে। আর দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরের মধ্যে। এ নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (সূরা লুকমান: ১৪)

সন্তানকে বুঝিয়ে বলতে হবে মা-বাবার সাথে ভাল আচরণে তাদের কী লাভ

মহান আল্লাহ আল কুরআনে বলেন:

"আর তোমরা আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। এবং মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার কর।" (সূরা নিসাঃ ৩৬)

"আল্লাহ আমাকে মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন, আর তিনি আমাকে অত্যাচারী ও হতভাগা করেননি।" (সূরা মারইয়াম: ৩২)

আল্লাহ বলেছেন:

"এবং তোমার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অবশ্যই অন্যের ইবাদত করবে না এবং মা-বাবার সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে থাকবে। তাঁদের মধ্যে কোনো একজন অথবা উভয়েই যদি তোমাদের সামনে বার্ধক্যে পৌঁছে যায়, তাহলে তাঁদেরকে উহ! শব্দ পর্যন্ত বলবে না এবং তাদেরকে ধমকের স্বরে অথবা গালি দিয়ে কোনো কথার জবাব দেবে না। বরং তাদের সাথে আদব ও সম্মানের সাথে কথা বলো এবং নরম ও বিনীতভাবে তাঁদের সামনে অবনত হয়ে থাক এবং তাঁদের জন্য এ ভাষায় দু'আ করতে থাক যেমন, হে আল্লাহ! তাঁদের উপর (এ অসহায় জীবনে) রহম করো। যেমন শিশুকালে (আমার সহায়হীন সময়ে) তাঁরা আমাকে রহমত ও অপত্যস্নেহ দিয়ে লালন-পালন করেছিলেন।" (সূরা বনী ইসরাঈল: ২৩-২৪)

মা-বাবার আনুগত্য করা ওয়াজিব

আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূল মুহাম্মদ (সাঃ) আমাকে ৯টি বিষয়ে ওয়াসিয়ত করেছেন : -

-

১) ইচ্ছাকৃতভাবে কখনো ফরয সলাত ত্যাগ করবে না। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সলাত ত্যাগ করল আল্লাহর কাছ থেকে সে জিম্মা মুক্ত হয়েগেল ।

২) কেটে টুকরো টুকরো করলে অথবা আগুনে জ্বালিয়ে দিলেও আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না ।

৩) কখনো মদ্যপান করবে না, কারণ মদ্য হল সকল অপকর্মের চাবিকাঠি । ৪) তোমার মা-বাবার আনুগত্য কর । যদি তারা তোমাকে তোমার দুনিয়ার (যাবতীয় কাজ) থেকে বের হয়ে যেতে বলে তবে তাদের নির্দেশ পালনার্থে তাই করবে ।

৫) যদিও তুমি তোমাকে অনেক বড় মনে কর তবুও তুমি যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পলায়ন করো না ।

৬) যদিও তুমি ধ্বংস হয়ে যাও তবুও তুমি যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পলায়ন করো না । ৭) তোমার পরিবার বর্গের উপর হতে (আদবের) লাঠি উঠিয়ে নিও না ।

৮) তাদেরকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভয় দেখিও ।

(সহীহ বুখারী)

মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার

আল্লাহ তা'আলা বলেন : আপনার প্রতিপালক ফায়সালা করে দিয়েছেন যে তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর আর কারো ইবাদত করবে না এবং মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। (সূরা বানী ইসরাঈল : ২৩)

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

আমি বনী ইসরাঈলের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাসনা করবে না এবং মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। (সূরা আল-বাকারা : ৮৩)

তোমরা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করো, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না মা- বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করো । (সূরা আন-নিসা : ৩৬)

তিনি অন্য এক আয়াতে বলেন ঃ

তোমার মা-বাবা যদি আমার সাথে এমন সব বিষয়কে শরীক করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহঅবস্থান করবে। (সূরা লুকমান : ১৫)

মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করা নাবীগণের বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

হে ইয়াহইয়া! দৃঢ়তার সাথে এই গ্রন্থ ধারণ করো আমি তাকে শৈশবেই বিচার বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দান করেছিলাম এবং নিজের পক্ষ থেকে দয়াদ্রতা ও পবিত্রতা দান করেছি। সে ছিল পরহেজগার । মা-বাবার অনুগত এবং সে উদ্ধত অবাধ্য ছিলো না । (সূরা মারইয়াম : ১২-১৪)

ঈসা (আঃ) বলেন :

তিনি (আল্লাহ) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সলাত কায়েম ও যাকাত আদায় করতে এবং মায়ের অনুগত থাকতে । (সূরা মারইয়াম ঃ ৩১-৩২)

মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) -কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন আমল আল্লাহর নিকট সবচাইতে বেশি প্রিয়? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : সময় মতো সলাত আদায় করা । আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন কাজ? তিনি বললেনঃ মা-বাবার সাথে সুন্দর আচারণ করা । আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর? তিনি বললেন : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা । (সহীহ বুখারী

মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহারের উপকারিতা

১। মা-বাবা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত । সন্তানের জন্ম ও তাদের লালন-পালনে আল্লাহর পরেই মা-বাবার অবদান সবচাইতে বেশী । মা-বাবার অবদান ও ইহসানের কৃতজ্ঞতা জানালে আল্লাহর ইহসানের কৃতজ্ঞতা জানানো হয় । তাদের অকৃতজ্ঞতা আল্লাহর অকৃতজ্ঞতারই শামিল ।

২। মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করলে ঈমান পরিপূর্ণ হয় এবং ইসলামী জীবন যাত্রা সুন্দর হয় ।

৩। মা-বাবার আনুগত্য করা উত্তম ইবাদত ও শ্রেষ্ঠ আনুগত্য ।

৪। মা-বাবার সন্তুষ্টি জান্নাতের চাবিকাঠি । মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার জান্নাতের পথে ধাবিত করে । যাকে আল্লাহ মা-বাবার সেবা-যত্ন করার সৌভাগ্য দান করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তাকে তিনি জান্নাতের পথে চলারই সুযোগ করে দিয়েছেন । যে ব্যক্তি এ সৌভাগ্য অর্জন করেছে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন ।

৫।মা বাবার অবাধ্যতার কারণে চেহারার লাবণ্যতা ও নূর দূরীভূত হয় ।

৬।অবাধ্য সন্তান কিয়ামতের দিন আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হবে ।

মা-বাবার দু'আ কবুল হয়

সাহাবী আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তিন ব্যক্তির দু'আ কবুল হয়। এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই । এক ঃ মাজলুমের দু'আ, দুই : মুসাফিরের দু'আ, তিন : সন্তানের বেলায় মা-বাবার দু'আ । (তিরমিযী)

অনেক সন্তানেরাই জানে না মা-বাবার মৃত্যুর পর কী করণীয়

"আবু উসাইদ (রাঃ) বলেন, আমরা নাবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সামনে উপস্থিত ছিলাম । এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! মা-বাবার মৃত্যুর পরও কি এমন কোনো পদ্ধতি সম্ভব যে, আমি তাদের সাথে সুন্দর আচরণ অব্যাহত রাখতে পারি? নাবী মুহাম্মদ (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ। চারটি পন্থায় তুমি তা করতে পার (১) মা- বাবার জন্য দু'আ এবং ইসতিগফার (২) তাদের কৃত ওয়াদাসমূহ এবং বৈধ ওসিয়ত (দান) পূরণ, (৩) বাবার বন্ধু-বান্ধব এবং মার বান্ধবীদের সম্মান ও আদর-যত্ন এবং (৪) তাঁদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় ও সুন্দর আচরণ করা, যারা মা-বাবার দিক থেকে তোমাদের আত্মীয় হন ।" (আল আদাবুল মাফরুজ)

১) দু'আ ও ইসতিগফার : সলাতের পর এবং অন্য সময় আল্লাহর নিকট কেঁদে কেঁদে দু'আ করা উচিত যে, হে আল্লাহ! আমার মা-বাবাকে ক্ষমা করুন । তাঁদের গুণাহসমূহকে মুছে দিন এবং তাঁদেরকে আপনি তাই দান করুন যা আপনি নেক বান্দা-বান্দীকে দিয়ে থাকেন । হে আল্লাহ! যখন আমরা সন্তানরা তাঁদের সাহায্য, স্নেহ ও লালন-পালনের মুখাপেক্ষী ছিলাম তখন তারা সবকিছু আমাদের জন্য ত্যাগ করেছিলেন। হে আল্লাহ! এখন তাঁরা তোমার নিকট সমুপস্থিত । শৈশবকালে অসহায় অবস্থায় আমরা তাঁদের মুখাপেক্ষী ছিলাম । এখন তাঁরা সেই সময়ের চেয়ে বেশী তোমার রহমাত ও সুদৃষ্টির মুখাপেক্ষী । হে আল্লাহ! তুমি তাঁদেরকে নিজের রহমাতের ছায়া দান কর এবং নিজের জান্নাতে তাঁদের আশ্রয় দাও । "রব্বির হামহুমা কামা রব্বা ইয়ানিস্ সগিরা"

২) মা-বাবার ওয়াদা ও ওসিয়ত পূরণ করা : মা-বাবা জীবিত অবস্থায় অনেক লোকের সাথে ওয়াদা করে থাকতে পারেন । বিভিন্ন ব্যাপারে কিছু ওয়াদা করতে পারেন । মৃত্যুর আগে ওসিয়ত (দান) করতে পারেন । মা-বাবার মৃত্যুর পর সন্তানের জন্য তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণের একটি পন্থা অবশিষ্ট থাকে । তা হলো তাঁদের কৃত ওয়াদাসমূহ ও ওসিয়ত পূরণ

করা । আর এভাবেই তাঁদের রূহকে খুশী করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে । কিন্তু তাঁদের জায়িয বা বৈধ ওসিয়তই পূরণ করতে হবে, তাঁদের অবৈধ ওসিয়ত নয় ।

৩) মায়ের বান্ধবী এবং বাবার বন্ধুদের সাথে আচরণঃ মা-বাবার মৃত্যুর পর তাঁদের সাথে আচরণের তৃতীয় পন্থা হলো, মায়ের বান্ধবী এবং বাবার বন্ধুদের সাথে সুন্দর আচরণ করা। সামাজিক জীবনে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদের মতো তাঁদেরকেও শ্রদ্ধা করতে হবে । তাঁদের মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে । বিভিন্ন প্রশ্নে পরামর্শের সময় তাঁদেরকে শরীক করা এবং সবসময় শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্বক তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ করা আবশ্যক । নাবী কারীম (সাঃ) বলেছেন : বাবার বন্ধুদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা সবচেয়ে সুন্দর আচরণ।

৪) মা-বাবার আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুন্দর আচরণ :মা-বাবার মৃত্যুর পর আচরণের চতুর্থ পন্থা হলো, মা-বাবার আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুন্দর আচরণ করা । মায়ের পক্ষের আত্মীয় যেমন- খালা, মামা, নানা-নানী প্রভৃতি এবং বাবার পক্ষের আত্মীয় যেমন চাচা, ফুফু, দাদা-দাদী ইত্যাদি । এ সকল আত্মীয়র প্রতি অমনোযোগী থাকা এবং বেপরোয়া ভাব প্রদর্শন প্রকৃতপক্ষে মা-বাবার প্রতি অমনোযোগী থাকার নামান্তর এবং একজন মু'মিন ও মু'মিনা মা-বাবার সাথে এ ধরনের আচরণ করতে পারে না । আল্লাহর রসূল (সাঃ) এর বলেছেন, তোমরা তোমাদের বাবা ও দাদার সাথে কখনও বেয়াদবসুলভ আচরণ করবে না । মা- বাবার সাথে বেয়াদবী করা আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়ার শামিল ।

যে সকল ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেছে কিন্তু ছোটবেলায় বাবা-মা থেকে দ্বীনি শিক্ষা পায়নি

যে সকল পিতামাতার সন্তানরা বড় হয়ে গেছে কিন্তু সন্তানের ছোটবেলায় পিতামাতার ইসলামের উপর সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে সন্তান-দেরকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারেননি! সত্য হলেও আজ অতি দুঃখের বিষয় যে এই বড় হয়ে যাওয়া সন্তানরা পিতামাতার সামনে অনৈসলামী জীবনযাপন করছে। এখন আর তারা বাবা-মার উপদেশ গ্রহণ করছে না, তারা তাদের ইচ্ছানুযায়ী চলছে । এখন প্রশ্ন ঃ এই বাবা-মা কী করবেন?

হতাশ হওয়া যাবে না। হাল ছেড়ে দেয়া যাবে না। উপদেশের মাধ্যমে তাদেরকে বুঝাতে হবে আর আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা'আলা যেন সন্তানদেরকে হিদায়াত দান করেন । আর পূর্বের ভুলের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে যেন আখিরাতের ময়দানে এই সন্তান পিতামাতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দেয়।

পরিশেষে বলতে চাই,

আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি কণা আল্লাহর দান। জীবনের প্রতিটি বিন্দু আল্লাহর দয়া। তাই আমাদের অস্তিত্ব ও জীবন আল্লাহর কাছে ঋণী। আমাদের উপর আল্লাহর অফুরন্ত নিআমতরাজির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি নিআমত হল আমাদের সন্তানেরা। নিঃসন্তান দম্পতি কিংবা সন্তানহারা মাকে জিজ্ঞেস করুন, বুঝতে পারবেন, সন্তান কত বড় নিআমত! আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেনÑ

وَ اللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَ حَفَدَةً وَّ رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَ بِنِعْمَتِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ.

আল্লাহ তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন। আর ভালো-ভালো জিনিসের থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। তবুও কি তারা ভিত্তিহীন জিনিসের প্রতি ঈমান রাখবে আর আল্লাহর নিআমতসমূহের অকৃতজ্ঞতা করবে? Ñসূরা নাহল (১৬) : ৭২রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনÑ

أَلاَ كُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ،... وَالرّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ،... أَلاَ فَكُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ.

শুনে রাখো, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। ... পুরুষ তার পরিবারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। নারী তার পরিবার, সন্তান-সন্ততির বিষয়ে দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।... জেনে রাখো, প্রত্যেক ব্যক্তিই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। Ñসহীহ বুখারী, হাদীস ৭১৩৮; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৯২৮

আরেক হাদীসের ঘোষণাÑ

ما مِن عبد استَرْعاه اللهُ رعيّةً، فلم يَحُطْها بنصيحة، إلا لم يجدْ رائحة الجنة.

আল্লাহ তাআলা যদি বান্দাকে কারো দায়িত্বশীল বানান আর সে নিজ অধীনস্তদের কল্যাণের ব্যাপারে যত্নশীল না হয়, তাহলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। Ñসহীহ বুখারী, হাদীস ৭১৫০

মোটকথা, সন্তান-সন্ততি পিতা-মাতার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত। তাদের ঈমান-আকীদা, বোধ-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, আমল-আখলাক, জীবন যাপন প্রভৃতির ব্যাপারে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেওয়া মাতা-পিতার কর্তব্য।

রেফারেন্স

১। ইসলামিক সায়েন্সের আলোকে প্যারেন্টিং

২। আল কাউসার আর্টিকেল

৩। বিভিন্ন অনলাইন সোর্স